উন্মাদের পাঠক্রম

বিভাস রায়চৌধুরী

মৃদু মজাই লাগে ভারতে, জয় গোস্বামী ১৩ বছর বয়সে জীবনের প্রথম কবিতাটি লিখেছিলেন বাড়ির পুরনো সিলিং পাখা নিয়ে। এক গ্ন, ভাবুক, বাল্যে পিতৃহীন ছেলে জয় -- অদূর ভবিষ্যতেই এই 'সিলিংপাখা'র কবি মগ্ন হয়ে গেলেন অন্ধকারের জটিল রহস্যে, ভেসে গেলেন 'খুরাকৃতি সেই জলে', যে - হ্রদে দেবতা বিশ্রামে বসেছিলেন। আমার তো অলৌকিক মনে হয় বাঙালি - ঘরের বড় চেনা কবিতাপ্রবণ এক কিশোরের এত দ্রুত 'ত্রীসমাস ও শীতের নেটগুচ্ছ'র অবিস্মরণীয় কবি হয়ে ওঠা। ১৯৫৪ সালে জয়ের জন্ম। ১৯৭৭ -এ ভাইরাস প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় ৮টি সনেট সম্বলিত ১২ পৃষ্ঠার কাব্যগ্রন্থ 'ত্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ', জয় তখন মাত্র ২২-২৩। সবাই বলে, এই বয়সে মনঃসংযোগ পাতলা হয়। স্বপ্নদোষে ঘুম ভাঙে বারবার। ভঙ্গুর ঝুঁকি নিতে ইচ্ছে হয়। বড় বড় বুক্নি এসে যায় কলমে। দেখি, জয় তখনই জানেন শান্ত বিস্ফোরণ, ধ্যানগম্ভীর অক্ষরবৃত্তের নিশ্বাস। কী করে ২২ -এর তণ কবি লিখতে পারেন---

'তার মানে তুমিও বস্তু, কিংবা প্রাণী, প্রত্ন, অনুমান...
তেরো লক্ষ বছরের শীত - ঘুম থেকে দীর্ঘ ফণা
তুলেছ কি মুছে যাবে! ধুলো, ছাই যা কিছু অর্চনা
কুণ্ডের ভিতরে করো, ফিরে এসো দৃঢ় পৌরাণিক
স্তম্ভের পাথরে, যার ভিতরে নিস্তব্ধ বিষ, জ্ঞান!'
(শীতঘুম)

সম্পূর্ণ অবচেতন - নির্ভর এই কাব্যপুস্তিকা। অথচ ছবি দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, অনুসরণ করা যাচ্ছে কবির পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি করা যাচ্ছে পুরো অভিজ্ঞতাটাই। আমার তো মনে হয় বাংলা কবিতার ইতিহাসে এত অল্প বয়সে কোনও কবি এই আশর্চ্য ক্ষমতায় পৌঁছোতে পারেননি। আবির্ভাবেই মস্ত ধাক্কা দিয়েছিলেন তিনি।
আর এই সময় তাঁর জীবন? পাঁচ বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছেন।। রানাঘাটের এক সাধারণ একতলা বাড়িতে থাকেন দুই ভাই আর তাঁদের আশর্চ্য মা। জয়ের মা ছিলেন রানাঘাটের লালগোপাল স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। ছোটবেলা থেকেই বারবার অসুখে ভোগা জয় একাদশ শ্রেণির বেশি পড়াশোনা চালাতে পারেননি। শিক্ষিকা মা ছিলেন উদার। জয়ের কবিতাচর্চাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতেন তিনি। বিভিন্ন কবির বই কিনে দিতেন। গ্ন ছেলেটির প্রতি তাঁর ছিল রহস্যময় দুর্বলতা। হয়তো অকালপ্রয়াত রাজনৈতিক কর্মী স্বামীর প্রতি না - ফুরোনো ভালবাসার কারণেই জয়ের কবিতাচর্চাকে তিনি এত পছন্দ করতেন। জয়ের গদ্য থেকেই তাঁর বাবার কাব্যপ্রীতি, বিশেষত রবীন্দ্র - প্রীতির কথা আমরা জানতে পারি।
'আমার বাবা ছিলেন ভগ্নস্বাস্থ্য ও পরিপূর্ণ বেকার। তাই বলে খিটখিটে বা ব্যাজারমুখো ছিলেন না। মা সকালে স্কুলে যাবার আগে -- বাবা যেখানটায় ফুলগাছ করতেন -- সেখানে ভাঙা টেবিলটা পেতে চা খাওয়া হতো। বলা হতো টি - পার্টি। ... সকালে মা স্কুলে চলে গেলে আমরা দু'ভাই ছিলাম বাবার বন্ধু। আমাদের সঙ্গে বসে পিচবোর্ড দিয়ে ছোটো ছোটো পোস্টার তৈরি করতেন। বাবার অনেকগুলো গোলাপগাছ। কিন্তু যতই যত্ন করো যতই জল দাও, সার দাও -- কুঁড়ি যেন

আর আসতেই চায় না--- মা তাই নিয়ে ঠাট্টা করে। একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখে, গোলাপগাছের পাশে পিচবোর্ডে কঞ্চি লাগানো পোস্টার পোঁতা রয়েছে 'তুই ফুটিবি সখী কবে।' রজনীগন্ধা লাগানো হয়েছে। ফুটেছেও খুব। তার পাশে প্ল্যাকার্ড পোঁতা হলো--- 'ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো।' ...পড়ে বড় হয়ে মায়ের কাছে শুনেছি, সেই সময় আমাদের খুব কষ্টে দিন যাচ্ছিলো। বাবার অসুখের প্রচণ্ড খরচ। সব জায়গায় ধার। কিন্তু সন্ধেগুলো বিচিত্রানুষ্ঠান হতো। বাবা মূল গায়েন। আমি সাকরেদ। কোনো কোনোদিন, অনেক সাধ্যাসাধনার পর হয়তো মা-ও ধরলো দু-এক কলি--- ওই, 'সকল দুখের প্রদীপ' কিংবা 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' -- সোৎসাহে আমরা গলা মিলিয়েছি...'।

(পাগল যে তুই)

ছোটবেলায় হারানো এই বাবাকে কখনও ভোলেননি জয়। তাঁর 'কবিতা সংগ্রহ' - এ কবি - পরিচিতিতে লেখা আছে, বাবার উৎসাহ -- আগ্রহের ফলেই তিনি কবিতায় উদ্বুদ্ধ। সর্বশেষ 'দেশ' পত্রিকার ২ অক্টোবর সংখ্যার ছোটগল্পে পড়লাম বাবার মৃত্যু - মুহূর্তের মর্মস্পর্শী কথন। কয়েক বছর আগে প্রকাশিত জয়ের 'অনুপম কথা' উপন্যাসে বাবা আর ছেলের অদ্ভুত সম্পর্ক আমাদের আচ্ছন্ন করেছিল, সেখানে অনুপমের বাবা শক্তির 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে অঙ্কিত জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান কল্পনায়, ছেলের সঙ্গে একান্তে বলেন তাঁর অনুভূতির কথা, বলেন --- 'ওখানে গেলে যে মরে গেছে সে-ও আর মৃত থাকে নারে। বলছি ওখানে সবাই আপনমনে থাকতে পারে। ওই হেমন্তের জঙ্গল এমনই ওখানে ঈশ্বর পোস্টম্যানের ইউনিফর্ম পরে ঘুরে বেড়ান রে!' আমি স্পষ্টতই ভাবি অনুপমের বাবার মধ্যে পরতে পরতে মিশে রয়েছেন জয় গোস্বামীর বাবা।

যা হোক, প্রেরণার মতো এই বাবা মারা গেলে জয়দের সংসারে অনেককিছুই বদ্‌লে যায়। শোকস্তব্ধ মা নাবালক দুই ছেলের জন্যে আপাত - স্বাভাবিক জীবনযাপন সু করলেও ভেতরে ভেতরে ফুরিয়ে যেতে শু করেন। তিনি পরলোকে বিশ্বাস করতেন। এক- একরাতে জেগে বসে থাকতেন অন্ধকারে, যদি স্বামীকে দেখা যায়; জয়ের তখন স্কুল - ভীতি প্রচণ্ড। অসুখের কারণে পড়া হত না, পরীক্ষা দেওয়া হত না, বছর নষ্ট হত। বাড়ি বসে পড়ার বই না পড়ে পড়তেন রবিনসন ক্রুশো, চাঁদের পাহাড়...। মা পড়ে শোনাতেন--- ছুটি, বলাই...। কদাচিৎ স্কুলে গেলে 'অ্যাই পাগলা' শুনে, 'হুডুর ছেলে' শুনে, পড়া না পেরে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে আসতেন। কল্পনাই ছিল তাঁর মুক্তির জায়গা। কল্পনায় তিনি ঘোড়ায় চড়ে মিশর যেতেন, তাঁবু ফেলতেন নীল নদের ধারে। রাতে পড়তে বসে দেখতে পেতেন 'চারদিকে গভীর জঙ্গল, রাত্রি, বৃষ্টি পড়ছে, ঘোড়ার পায়ের শব্দ ভেসে আসছে দূব থেকে...'। অসুখ ও হীনমন্যতা জয়কে নিঃসঙ্গ করেছিল। নিঃসঙ্গতা তাঁকে করে তুলেছিল কল্পনাপ্রবণ। কল্পনা তাঁকে দ্রুত নিয়ে গিয়েছিল সাধারণ 'সিলিংফ্যান' থেকে তীব্রতম কুয়াশামাখা 'ত্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ'-এ।

মা তখন একমাত্র অবলম্বন। আর কোনও কিছু মাথায় নেই। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী জয় অসুখ, কল্পনা আর বিষণ্ণতা নিয়ে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরলেন কবিতাকে। লেখার চেষ্টা ছাড়া অন্য কোনও কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠতে চাইলেন না তিনি। জয়ের নিকটরন্ধুরা বলেন, ওকে পাগলের মতো লাগত, কাউকে চিনতে পারত না তখন, একটা ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে বেড়াত রানাঘাটের এ - গলি, ও - গলি, অনেক সময় আওয়াজও খেত। জয়ের ভাই তিলকদার সৌজন্যে রানাঘাটের বাড়িতে সেই সময়ের জয় গোস্বামীর ছবি দেখেছি--- রোগা হিলহিলে তণ, একমাথা ঝাঁকড়া চুল, ঝুলন্ত দাড়ি, পরনে পাঞ্জাবি আর প্যান্ট, আর চোখজোড়া সুদূর আগুন। খ্যাতনামা এক চিত্রকর 'বসন্ত কেবিন'-এ জয়কে দেখে বলেছিলেন 'তণ রবীন্দ্রনাথ'। কেউ বলেছে, যিশুর মতো, বোঝা যায়, তাঁর সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ তেজ অনেককেই পুড়িয়েছে। জীবন আর কবিতা একাকার হয়ে গেলে বুঝি এমন হয়? কবিতা - আক্রান্ত আমি বরং 'প্রত্নজীব' - এর দিকে যাই। প্রথম পুস্তিকার পরের বছরেই 'পরমা' থেকে প্রকাশিত হল ৬৬ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ এই কাব্যগ্রন্থ, যেখানে রয়েছে 'ত্রীসমাস' - এরই অন্যরকম বিস্তার। 'ত্রিসমাস' প্রকাশিত হওয়ার আগের সময়ের অনেক কবিতাই আছে এখানে। অন্ত্যমিলের জাদু ১৯৭৭ সালে লেখা 'সাদা বিষ কালো বিষ' কবিতায় জয় যা দেখিয়েছেন, যার রেশ 'প্রত্নজীব' - এর আরও কবিতায় রয়েছে, তাকে টুকে আজ প্রায় ৩০ বছর পরেও বিশিষ্ট হওয়া যায়। তবে মনে রাখতে হবে, এখানে বিষয় আর ছন্দ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, অন্ত্যমিল মাথায় রেখে কবিতা বানাতে গিয়ে কবিতাটা একদিকে অনেকটা হেলে পড়েনি, গুভার অক্লেশে বহন করে গেছে জয়ের কবিতা, লঘু ছড়া হয়ে যায়নি। ওই নবীন বয়সে কী করে এসব আয়ত্ত করেছিলেন জয়?

‘...তার যে কী হবে আমি জানি না।
সে তো কবি, খুব কিছু জ্ঞানী না ---
অথচ সেদিন নীল কেবিনের

বাইরে তুষারঝড় আসত,
আর সেই ভঙ্গুর স্বাস্থ্য
ছেলেটির ‘কেন চিঠি দেবে না’

এই মৃদু ঘন অনুযোগকে
ঢেলে দিত স্বপ্নের যজ্ঞে
তোমার মতন দুঃস্বপ্নাও!

কিংবা যখন বৃষ্টির নখ
ছুটে যেতো মাঠে বিস্তীর্ণ
তুমি কি বলোনি তাকে ‘সব নাও’!

আচমকা খুলে যাওয়া বেনীতে
একবার চুম্বন কে নিতে
চায় না? যে কেউ নিতে পারত

এমন সুযোগগুলি? অথচ
তোমারই সামনে দিয়ে কত চোর
চলে গেছে, তবু মৃৎপাত্র

পোষা পাখিটির কালো চঞ্চুর
আঘাত লাগিয়ে তুমি চুরচুর
করেছ--- তখনই গ্লেসিয়ার কি

কেঁপে উঠেছিল এ - সমুদ্রে?
তোমার আগামী স্বামী - পুত্রের
ভালো চাইবার বেশি আর কী

চাইতে পারব আমি? তবু কে
নখর ছোঁয়াল এসে ও বুকে?
রেখে গেল নীল দাগ দীর্ঘ?

আজকে আবার যদি ফিরতে
চাও তবে শকুনের তীর্থে
সিঁথিতে কে ছাইবে আবীর গো?...

(সাদা বিষ কালো বিষ)
'জিভ', 'শুভ আগুন শুভ ছাই', 'ভ্রূণ' -- কবিতাগুলো দীর্ঘ, অতীত - প্রাণ, অথচ আধুনিক জখমে ভরা। অতীত - ইতিহাসের জীবন্ত সত্তায় আজকের জীবনের চকিত প্রয়োগ বাংলা কবিতায় বিস্ময়কর ও অভিনব---

'...তারপর পর্বতমালা মাথা তুলছে জলের ভিতর
থেকে, হু হু করে জল ঢুকে পড়ছে পাশের ডাঙায়...
কালো সুড়ঙ্গের মতো গুহার ভেতর থেকে
এরপর বেরিয়ে এল দু-পায়ে ভর করে
সামনে একটু ঝুঁকে পড়া রোমশ প্রাণীটি,
ছোট গর্তে বসা চোখ, থ্যাবড়া চোয়াল,
ঘন কালো রোমাবৃত স্তন, তার হাতে
ঝোলানো হরিণ একটি। তাঁর কাঁচা মাংস চামড়া হাড়
নখ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেতে খেতে একবার মাথা তুললো সে,
সারা মুখে গাঢ় রক্ত... স্টীল ফ্রেম চশমা আর কাঁধের উপরে খাটো চুল
আনমনা কফির কাপ থেকে ঠোঁট তুলে
জানলায় বৃষ্টির দিকে তাকিয়েছে মেয়েটি, একটু খোলা ঠোঁট...'
(ভ্রূণ)

দৈব, আধভৌতিক, প্রেমিক কল্পনা ছাড়া এই লেখা সম্ভব? পঁচিশ বছর হওয়ার আগেই জয় অমরত্বের রসদ সংগ্রহ করে নিয়েছেন। এই সময় অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতা প্রকাশ পাচ্ছে। এক - আধটা বড় কাগজে। ব্যাপক পাঠকের সামনে প্রতিষ্ঠিত হননি তখনও, কিন্তু কবিসমাজে সবাই তাঁকে বিস্ময়ের চোখে দেখতে শু করেছিল। তাঁকে ঘিরে জড়ো হচ্ছিল ক্রমশ লিটল ম্যাগাজিনের তণ কবি বন্ধুরা। মেদিনীপুরের শ্যামলকান্তি দাশ শ্রীরামপুরের মৃদুল দাশগুপ্ত, 'অভিমান' -- কবিতায় প্রতিষ্ঠিত নাম। সমমনের বন্ধুদের পেয়ে আরও জেগে উঠলেন জয়। ১৯৮১ সালে 'অভিমান' থেকে প্রকাশ পেল ৮০ পাতার কাব্যগ্রন্থ 'আলেয়া হ্রদ'। তখন গুতর অসুস্থ হন বারবার এই গ্ন যিশু। প্রত্নকল্পনায় এবার শরীরের কষ্ট এসে মিশল, আরও তীব্র হল প্রেমপ্রত্যাশা। শুতেই কবি- উচচারণ--- 'আমার সমস্ত বীজ ভরে ভরে দেব রাত্রিভোর/ ছবিমামা, আমার শরীর/ কখনো সারবে কি আর?'। এই কাব্যগ্রন্থে এসে মিশল পরাবাস্তবতার শক্তি আর বিজ্ঞান -- মহাকাশবিজ্ঞান। পূর্ব প্রকাশিত পরবর্তীকালের জয় সবচেয়ে বেশি আঁকড়ে ধরেছেন এই মহাকাশ চেতনাকেও। গদ্যে বলেছেন--- 'আমি আত্মজীবনীই লিখতে চেষ্টা করি। এই পৃথিবীতে, পৃথিবীর বাইরেও আমার জীবদ্দশায় যা কিছু ঘটছে, ঘটবে, সবই আমার আত্মজীবনী। সম্প্রতি একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ ধরা গেছে--- যদিও আসলে তা ঘটেছিল বহুশত বছর আগে, পৃথিবীতে তার ঢেউ মাত্র আজ এসে পৌঁছল... তবু আমার মনে হয়, এই পুরো সময়টাই যেন আমার আত্মজীবনীর অন্তর্গত হয়ে গেল। যেন এই ঘটনা আমার জীবনেরও রচনাকালের মধ্যে আছে।' (নিজের জীবন, বীজের জীবন)১৫-৬-৮০ তে রচিত কবিতায় কী দূর্দান্ত এক আত্মজীবনী---

'আত্মার তলায় আছে লাল কুণ্ড, তাতে মুখ ডুবিয়ে দিলাম
যে - সব গানের বৃক্ষ জাদুকথা জানে
যে-সব রাক্ষুসে মাছি বিষপোকা মুখে করে আগুনের মধ্যে গিয়ে বসে
খানিকটা আগুন খেয়ে উড়ে যায় -- তাদের উদ্দেশ্য করে এই
আত্মার চরমে আমি সারামুখ ডুবিয়ে দিলাম, আর সবরকম বিকীরণ
বন্ধ হয়ে যাওয়া এক তারা
বিশাল শরীর নিয়ে ভেসে ভেসে সামনে এল, তার অন্ধকূপ নাম

মুছে দিতে চাই বলে আমি
ওই লাল কুণ্ড থেকে তাকে উপহার দেব প্রাকৃতিক একটি ফোয়ারা...'
(কুণ্ড)

বাংলা কবিতা যতটুকু আমি পড়েছি, তাতে মনে হয়েছে এইসব কবিতার কোনও আগে - পরে নেই। নববই দশক জয় - প্রভাবিত নিঃসন্দেহে, কিন্তু তা 'ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা' -- পরবর্তী জয়ের অনুসরণ, অনেকাংশে পরিষ্কার অনুকরণও। কিন্তু এই জয় গোস্বামীকে আত্মসাৎ করতে গেলে ভয় পেতে হয়। আত্মার তলদেশে নামতে হয়, আগুনের মধ্যে থাকতে হয় অনিশ্চি। অতএব ভবিষ্যৎ। অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য পথকেই টোকার চেষ্টা করেছে। 'আলেয়া হ্রদ' তবে কে? যে জয়কে রেখে গেছে 'এই রক্তমেঘ দিয়ে ঢেকে'!
জয়ের একমাত্র অবলম্বন মা, মহীয়সী সেই জননী, হঠাৎ অকাল প্রয়াত হলেন ১৯৮৪ সালে। দুইভাই প্রকৃত অর্থে অনাথ হয়েগেলেন। ভয়ংকর বাস্তবতার দুর্দান্ত নখ নিয়ে আছড়ে পড়ল দুই ভাইয়ের জীবন। জয় কবিতা ছাড়া কিছু জানেন না। তাঁর ভাই যেকোনও একটা কাজের খোঁজে এখানে - ওখানে ঘুরে বেড়ান। হতভম্ব দুই ভাইয়ের জীবনে নেমে আসে অনাহ ারের অভিশাপ। শুনেছি পঞ্চাশের এক বড় কবি শ্রাদ্ধের দিন গোপনে টাকা দিয়ে এসেছিলেন। প্রায় ছ'মাস প্রতিবেশী বন্ধুদের সহযোগিতায় কোনোত্রমে বেঁচে ছিলেন তাঁরা। অনাহারের ভয় আর রোগযন্ত্রণায় কেটেছিল ভয়ংকর সেইসব দিন। আর তীব্র কষ্টের মধ্যে থেকে জয় লিখেছিলেন একের পর এক তীক্ষ্ণধার কবিতা। ১৯৮৬ সালে সুবচন থেকে বের হয় শ্বাসরোধকারী, গতিশীল, দুর্বিনীত সুবিখ্যাত সেই কাব্যগ্রন্থ 'উন্মাদের পাঠত্রম'। সে এক অপূর্ব আর্তনাদ। সে এক সর্বনাশ - বমি - করা ছন্দ। কিছু পরে 'রক্তমাংস' পত্রিকায় একজন আলোচক জয়কে 'র‍্যাঁবো'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, তাঁর কারণ এই 'উন্মাদের পাঠত্রম' রচনা। ৪৪ পাতার বইটির নিন্দে করতে গিয়ে একজন লিখেছিলেন,বইটি পড়তে পড়তে তাঁর মনে হচ্ছিল কেউ তাঁকে কার্বন - মনোঅক্সাইডে ভরা ঘরে আটকে রেখেছে। আমার তো মনে হয় এটা প্রশংস াই। অগ্ন্যুৎপাতের সহসা উত্তাপ, প্রপাত ছেড়ে ঝর্নার ছুটে আসার গতি এবং অর্ধচেতন জীবনের মন্ত্রোচ্চারণের ঋদ্ধ ক াব্যগ্রন্থটি কলেজজীবনে অন্তত আমার সেয়ানা - স্বপ্নকে পুড়িয়ে দিয়েছিল, ছাই করে মিশিয়ে দিয়েছিল হাওয়ায়। আচমক া, কবি শুভংকর পাত্রের নির্দেশে বইটি ঘরে এনে, সেই আমার প্রথম জয় গোস্বামীর খপ্পরে পড়া! কয়েক বছর ধরে পড়ে অ াসা বাংলা কবিতা যে - আমাকে তৈরি করেছিল, তা বদ্‌লে গেল নিমেষেই। জীবনটাই গোলমেলে হয়ে গেল। কোথাও তল পেলাম না। জয়ের সঙ্গে আমার ঠিকঠাক আলাপহল উনি 'দেশ' পত্রিকায় যোগ দেবার পর নববইয়ের গোড়ায়। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ - হুঁ সম্পর্ক চলল আরও ছয় - সাত বছর। তারপর অতিপ্রতিষ্ঠিত কবি জয় গোস্বামী কলকাতা শহরের জটিলতায় একা হয়ে যাওয়ার পর এখন কিছুটা খোলামেলা কথা হয়। নানারকম সাফল্য - নিন্দা এসেছে তাঁর জীবনে। সেসব আসতেই পারে। আমি কিন্তু তাঁকে 'উন্মাদের পাঠত্রম' - এর সেই বিষদাঁত - অলা কবি হিসেবেই অবাক চোখে দেখি। আজও সেই ঘোর আমার কাটেনি। বাংলাভাষার অমর কাব্যগ্রন্থ হিসেবে 'উন্মাদের পাঠত্রম' বহুকাল থেকে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। মায়ের মৃত্যুদিন ১২ মে ৮৪ রাত্রির সমস্ত শ্মশ ানবন্ধুকে উৎসর্গ করে জয় লিখেছিলেনশ্মশানকৃত্যের নতুন মন্ত্র---
ধায় রাত্রি ধায় রাত্রি আয় ধাত্রী ভাণ্ড খুলি তোর
লিখেছি সাতকাণ্ড আমি খণ্ড করে ফ্যাল আমাকে খণ্ড হাড় খণ্ড উ
দ্বিখণ্ডিত বস্তিদেশ, অণ্ডকাটা শিখণ্ডিত মুণ্ডুঅলা দেহ
জগৎভূমে নৃত্য করে হাত পা ছুঁড়ে নৃত্য করে
অগ্নিভুঁড়ি ফাটিয়ে শেষকৃত্য করে তোর
করে না, কেউ করায় তাকে, ও ঠেরে ধূম লক্ষ পাকে
যজ্ঞভূমে কাটা আঙুল লকলকিয়ে বৃক্ষ আঁচড়ায়
হা লকলক হো লকলক ভুঁয়ে গড়ায় জ্যান্ত চোখ
কী আনন্দে স্কন্ধ ছিঁড়ে শরীরহারা কামানো এক মাথা

যায় রে যায় শূন্যপথে কাটা গলায় অগ্নি পড়ে
শেষ কামড়ে কামড়ে ধরে বক্ষহারা ভাণ্ড তোর লৌহলালা খায়

ধায় রাত্রি ধায় রাত্রি মাতৃহারা যায় রে গঙ্গায়...

'উন্মাদের পাঠত্রম' -এর প্রতিটি শব্দ - অক্ষর ২১ বছর পরেও আজও কী প্রবল জ্যান্ত। আমার বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এসো চাকা'-র কথা মনে পড়ছে। কেবলই মনে হল সিদ্ধির চূড়া। এই -ই হল স্নায়ুর চূড়ান্ত লিখন। এই-ই হল মৃত্যুকে ত াড়া করবার দম। 'চিৎসাঁতার' কবিতার এই অংশে আজও এইমাত্র এক্ষুনি কান্না চাপতে পারছি না---
'কিন্তু যখন আসব পরেরবার
আমি কবিখ্যাতি চাই না, প্রীতি ও শুভেচ্ছা চাই না, না সমুদ্র চাই না
তোকেও
কেবল এই মাকে চাই, কেবল এই ভাইকে চাই, বাবা যেন না মরে
শৈশবে, যেন এর চেয়ে সুস্থ দেহ নিয়ে
নিজের খাবার নিজে উপার্জন করে নিতে পারি'।
বিপন্নতার লাবণ্যশক্তি কতখানি, কতখানি তার খাম্চে ধরার ক্ষমতা, তার চোরাটানও - বা কতটা অটুট--- বুঝতে পারি। অভিবাদন জয়কে। পাঠকের হৃদয়ে, তার প্রতিষ্ঠা হল এই 'উন্মাদের পাঠত্রম' থেকেই। অনেক শোক, অসুস্থতা, দারিদ্র্য, নিঃসঙ্গতা, আঘাত, বিষণ্ণতা পেরিয়ে কবিতার জন্যে তান্ত্রিকের মতো বিপজ্জনক সাধনা চালিয়ে গেছেন তিনি। তারপর এই শীর্ষে পৌঁছনো। দু'দণ্ড বিশ্রাম পর্যন্ত না নিয়ে দ্রুত তিনি অন্য খেলা সু করলেন। এরপর থেকে তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ আলাদা আলাদা বিষয়, ঝুঁকি ও সৌন্দর্য নিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত। প্রতিবারই মনে হয় এই খেলাই সবচেয়ে অদ্ভুত। তারপরেই আসেফের অন্য চমক। বিশ্লেষণে যাব না। জয় এখন্য অত্যন্ত জীবিত কবি এবং সত্রিয়। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে কত না অজানা খেলা। আমাদের পরম সৌভাগ্য আমাদের সময়ে এতবড় এক কবি জন্মেছেন, যাঁর লেখা পড়তে পড়তে আমর া যুবক হলাম, যুবকতর হলাম, যাঁর লেখার সঙ্গে চলতে চলতে আমি পৌঁছে যাব জীবন - সীমান্তে। তুচ্ছ জীবনে এই কি কম পাওয়া? একজন কবির হয়ে - ওঠা কেমন, সেই প্রসঙ্গে লিখছি বলেই, লেখার প্রয়োজনে আর দু'টি কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ করব। ১৯৮৮ তে প্রতিভাস থেকে প্রকাশিত হয় 'ভুতুমভগবান'। এখানে উন্মাদ যেন স্পষ্ট আচরণকরছে। প্রকাশ্য হল তার খিস্তি, দগ্‌দগে রাগ। পরিষ্কার উচচারণ, যেন রহস্যকে এবার ছুটি দিয়েছেন। 'অভিসার' কবিতায় 'যে আছ ক্ষুধ ার্ত পাখি/ সব শালা ডাকো গাছে গাছে' বা 'রক্তবীজ' কবিতায় 'দুর্গা দুর্গতিনাশিনী / ভিক্ষে নিতে আমি আসিনি' থাপ্পড় মারে আমাদের গালে। প্রেমও এখানে শেষ কথা বলছে---
'নিশ্বাস নিতে দেব না, তোমাকে
নিশ্বাস নিতে দেব না
একবার যদি পাই, পুনরায়
আরবার যদি পাই
পাঁজরে পাঁজরে গুঁড়ো করে দেব -- ছাই!'
(চুম্বন)
'ভূতুমভগবান' দীর্ঘকবিতায় বদ্‌মেজাজিরা যেন বলছে--
'ঝাড় খেতে খেতে শেষ হয়ে গেছি
ঝাড় খেতে খেতে শু
অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়েছি, গু।
এখন আর আমি ছাড়ার পাত্র নই
হাত - পা তখন শক্ত হয়েছে, দু - বেলা

দু - মুঠো না পেলে
অশান্তি করবই।'
এক সাক্ষাৎকার 'কেন এই রাগ' প্রসঙ্গে জয় গোস্বামী বলেছিলেন, সেই ভয়ংকর সময়ে, প্রায়ই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে, শুভানুধ্যায়ীদের বদান্যতায় কাটাতে হচ্ছে জীবন, তাঁর মাথা গরম হয়ে যেত এই ভেবে যে, তিনি একজন কবি, অথচ অর্ধাহারে - অসুস্থতায় একটিও নারীচুম্বন ছাড়াই তিনি মরে যাবেন সবার অজান্তে।
আমাদের সৌভাগ্য তা হয়নি। মৃত্যুকে দূরে ঠেলে তিনি অচিরেই ফিরে এসেছেন 'ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা' কাব্যগ্রন্থ নিয়ে। ১৩৯৬ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তৎক্ষণাৎ বইটি সম্মানিত হয় আনন্দ পুরস্কারে। বৃহত্তর পাঠকসমাজে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর কবিতা। অপরূপ ভালবাসা বইটির সম্পদ। সবার হৃদয় ভেসে গেল অলকানন্দা জলে। কবি কামনা করলেন---
'পৃথিবী দেখুক, এই তীব্র সূর্যের সামনে তুমি
সভ্য পথচারীদের আগুনে স্তম্ভিত করে রেখে
উন্মাদ কবির সঙ্গে স্নান করছ প্রকাশ্য ঝর্নায়!'
(স্নান)

ঝাউপাতাকে গ্ন কবি চিঠি লিখলেন--- 'ঝাউগাছের পাতা, আমি তোমার কাছে চুম্বন চাইব না'। অথচ হাজার - হাজার চুম্বন ছুটে এল কাব্যগ্রন্থটির পাতায় পাতায়। মরে যেতে যেতে, ডুবে যেতে যেতে এক কবি ভেসে উঠলেন। ভেসে রইলেন পাঠকের মনে। আজও তিনি বিস্ময়কর। কখনও অন্ধকারের, কখনও আলোর লেখায় তিনি মগ্ন। লোকপ্রিয় কবি হলেও রহস্যকে, তপস্যাকে ভোলেননিজয়। পঞ্চাশ পেরিয়েছেন সদ্য। রানাঘাট ছেড়ে জীবিকার কারণে এখন কলকাতায় থাকবেন। আমি তাঁকে ঘিরে প্রবল ভিড় দেখেছি। তাঁকে একঘরে ক'রে দেওয়াটাও দেখলাম। শুধু কখনও দেখিনি কবিধর্ম থেকে তিনি বিচ্যুত। সাময়িক কোলাহলে বিভ্রান্ত হলেও দ্রুত নির্জন হয়ে যেতে পারেন তিনি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন--- 'প্রতিষ্ঠান ভেঙে যায় বহুদিন সুসময় লেগে'। জয় তাঁর গায়ে সুসময়কে বেশিদিন বসতে দেন না। ক্রমশ মেহনার দিকে বয়ে চলেছেন তিনি। দুই তীরের সবকিছু নিয়ে প্রবল একা- একা।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com